WME 1886

সুদীপ্ত দাস

পড়ন্ত বিকেলের ফ্যাকাশে হলুদ আলোতে গ্রিন লাইন, রেড লাইনের কালো ধোঁওয়ায় তৈরী পুরোনো হিন্দি ছবির কোনো স্বপ্নের দৃশ্যের ব্যাকড্রপের মধ্যে দিয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটতে হাঁটতে আপ্পু ঘরের মেইন গেটটা পেরিয়ে বাঁ দিকে বেঁকে গেলাম - পুরানা কিলা রোড ধরে। রবিবারের বিকেল, উদাসীনতার সব রকম উপাদানই এসে জড়ো হয় এই সময়। যে সপ্তাহ শেষের অবকাশের জন্য সারা সপ্তাহের অপেক্ষা সে কেমন যেন বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হাতের নাগালের বাইরে চলে গেল - কাল থেকে আবার প্রাত্যহিক নিয়মে *পুনর্মূষিকভবন*। ছোটো বেলায় পড়া একটা কবিতার প্রথম লিনটাই শুধু মনে আসছে বার বার "সোম মঙ্গল বুধ এরা সব আসে তাড়াতাড়ি"।।

একেবারে নির্ভাবনা হয়ে কিছুটা সময় কাটাবো বলেই প্রগতি ময়দানে বাস থেকে নেবে সোজা হাঁটা শুরু করেছি। কোনো কিছুর দিকে জোড় করে নজর না দিয়ে হাঁটার চেষ্টা করছি। এও এক ভাবনার বিষয়। কিছুতেই নির্লিপ্ত হয়ে চলা যাচ্ছে না। রাস্তা ঘাটে অনবরত মানুষ, গাড়ির অবিরাম স্রোত। কিছু কিছু ছোটো ছোটো ঘটনা কোথাও না কোথাও ঠিকই হয়ে চলেছে যা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, কিছুতেই মনকে নির্লিপ্ত থাকতে দিচ্ছে না। যেমন একটা মোরে একটা মারুতি গাড়ি বাঁ দিকে ঘুরতে পারছে না বলে সামনে দাঁড়ানো একটা বিশাল বাসকে অহেতুক হর্ন দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ মনে পরে গেলো ছোটো বেলায় একবার

বাংলাতে বাক্য রচনা করতে দেওয়া হয়েছিলো *"বৃথা আস্ফালন"* দিয়ে। তখন কি রচনা করেছিলাম মনে নেই। তবে এখন দিলে কি লিখতাম তা মনে হওয়াতে মারুতি চালকটির প্রতি সহানুভুতি হলো - বাইরের দিকে নজর চলে যাওয়াতে জোড় করে সেই দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে এগিয়ে চললাম। কিন্তু আবার আটকে পড়লাম আরেকটা দৃশ্যতে। একটা ভিখারী এক গুজরাতী বৃদ্ধাকে দশ পয়শা ফেরত দিয়ে দিলো আর তক্ষুনি সেই বৃদ্ধা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো। আমার মনে পরে গেলো রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতার কথা - *'দীনদান'*। নামকরণের স্বার্থকতা লিখতে গিয়ে একটা লাইন লিখতেই হতো যে কোনো কিছু দান করে সেই দানের মধ্যে যদি কোনো অহমিকা থাকে তাহলে সে দান *'দীনদান'* হয়ে যায়। আমার মনে হলো বৃদ্ধাটি কি জানে যে তার দান বর্তমানে দীনদানের শ্রেণীভুক্ত? ঊফ, আবার নির্লিপ্ত হবার পথে পরম অন্তরায়। নাহ, আর পারা যাচ্ছে না, এইবার একেবারে *স্থিতপ্রজ্ঞ* হয়ে চলবো - *সুখে বিগতস্পৃহ* আর *দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন*। ঠিক বললাম কি? নাকি *'বিগতস্পৃহ'* আর *'অনুদ্বিগ্নমন'* শব্দগুলো অদল বদল করে ফেলেছি? আবার কিছুটা সময় শ্লোকটা মনে করতে করতে কেটে গেলো - কিছুতেই মনটাকে একেবারে অকেজো করা যাচ্ছে না, কিছু না কিছু করেই চলেছে!!

ইন্ডিয়া গেটের চারিদিকে যে বহুভূজাকৃতি রাস্তা রয়েছে সেখানে এসে পড়লাম। দিল্লীর একমাত্র খোলা মাঠ এই ইন্ডিয়া গেটের চারিদিকে। কাতারে কাতারে মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে সেখানে। বাচ্চা কাচ্চা ছুটে বেড়াচ্ছে, বল খেলেছে, মেয়েরা কুকুর নিয়ে আদিক্ষেতা করছে, কিছু কিছু স্বাস্থ স্বচেতন অতিকায় মোটা মানুষ হাত পা ছুঁড়ে মেদ কমাবার জন্য 'বৃথা আস্ফালন' করে চলেছে। বিশাল লম্বা লাইন পেরিয়ে যারা বোটিং করছে তাদের মুখে একটা সদ্য গীতাঞ্জলী লিখে নোবেল প্রাইজ পাবার আনন্দ, আর যারা লাইনের একেবারে শেষের দিকে তাদের মুখে একটা মোহময় পৃথিবীর নানান উত্থান পতনের করাল ছায়া - "আরো কতো দূরে আছে সে আনন্দধাম", বা "পথের ক্লান্তি ভুলে স্নেহ ভরা কোলে তব, মা গো,

বলো কবে শীতল হবো" - এই ধরেনের কিছু একটা গান যদি ওদের গলায় লাগিয়ে দেওয়া যায় তাহলেই কেল্লা ফতে, পরের বছর কান ফেস্টিভ্যালে একটা ভাল্লুক তো বাঁধা ধরা - তা সে সোনারই হোক বা টিনের। কিছু কিছু সদ্য প্রেমে পড়া ছেলে মেয়ে নিরিবিলি ঝোপ ঝাড় খোজার ব্যর্থ চেষ্টা করে যাচ্ছে, কিন্তু হায় ভগবান, ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ছোটো এই মাঠ - ঈশ, কি বিচ্ছিরি ছন্দ পতন, কিন্তু 'তরী' শব্দটা কিছুতেই যে এখানে ব্যবহার করতে পারবো না!!

কোথায় এসেছিলাম মনকে বিশ্রাম দিতে, কিন্তু তিনি তো অনবরত কিছু না কিছু গ্যূঢ় তত্ত্বের বিশ্লেষণ করেই চলেছেন।

সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ একটা গাড়ির নম্বর প্লেটটা দেখে থমকে গেলাম - ডাব্ল্যু এম ই ১৮৮৬, আম্বাস্যাডর - মার্ক ফোর।

এতো বছর পরেও ঠিক আগের মতই আছে। শুধু বয়সের রেখা পড়েছে কয়েক যায়গায়, যেমন মাডগার্ডে বা স্টিয়ারিংএ। আগের সবুজ রংটা বদলে কালো করে দেওয়া হয়েছে। সামনের উইন্ডস্ক্রনটাও ছিলো না, মাথায় লাগেজ ক্যারিয়ারটাও নতুন সংযোজন। কলকাতায় চলার সময় ফগ লাইটের কোনো প্রয়োজন ছিলো না, কিন্তু এখন হয়েছে। বয়স হয়েছে বলে বোধ হয় সুন্দর দেখার জন্য একটু অন্যান্য টুকিটাকির প্রয়োজন হয়ে উঠেছে আজকাল। দেহের বাইরের জৌলুষটা একটু বেড়েছে। যেদিকটা, সেই কবে মনে নেই, সাত নম্বর বাসটা ঘষে দিয়ে চলে গেছিলো, সেদিকটাতে সেই ক্ষতের চিহ্ন আর নেই। ভালো করে হাত বুলিয়ে দেখলাম সত্যিই, ক্ষত চিহ্নটা আর নেই ঠিকই কিন্তু মনে হলো যেন দোর্দন্ড সেই সাত নম্বর বাসের উপেক্ষায় ভরা চাহনি আর রাস্তার একেবারে ধারে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আমাদের সেই অপমানের কথা আজও গাড়িটা ভোলে নি। মনে হল যেন গাড়িটাও আমাকে এত বছর ধরে খুজে এসেছে। আজ এতো দিন পরে আমাকে পেয়ে সেও যেন খুবই খুশী!! আমি হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম গাড়িটার গায়ে, মাথায়, পায়ে।

হথাৎ যেন বহুদূর থেকে একটা কথা ভেসে আসলো, "এক্সকিউজ মি"। আমি সম্বিৎ ফিরে পেলাম। উঠে দাঁড়িয়ে দেখলাম খুবই বিস্মিত হয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে একটি তরুণী, পরনে সেই চিরচারিত দিল্লীর মেয়েদের জাতীয় পোষাক - নীল টাইট জিন্স আর কালো টি শার্ট। আমি মাটিতে বসে তখন গাড়ির চাকায় হাত বোলাচ্ছিলাম, তাই মেয়েটিকে একটু ঝুঁকে পড়েই আমাকে কথাটা জিজ্ঞেস করতে হয়েছিলো। চোখ তুলে যখন চেয়েছিলাম ওর চোখের দিকে দেখেছিলাম শুধু বিস্ময়। আমি খুবই অপ্রস্তুত হয়ে বাংলাতেই জিজ্ঞেস করে ফেলেছিলাম, "গাড়িটা কি আপনার"? মেয়েটি আমাকে বাংলাতেই 'হ্যাঁ' বলাতে আমি আরো কিছুটা বাস্তবে ফিরে এলাম এবং কিজেকে সামলে নিলাম। ও বলল, "কিন্তু আপনি ??....."!! ওর বিস্ময় যেন ক্রমে বেড়েই যাচ্ছিলো। আমার খুবই অপ্রস্তুত লাগছিলো। কি ভাবে কি কথা বলবো কিছুই বুঝতে না পেরে কোনোরকমে 'দুঃখিত' বলেই সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্য অন্য দিকে হাঁটতে শুরু করলাম।

সবে মাত্র হাঁটতে শুরু করেছি, পিছন থেকে আবার কথা ভেসে এলো।, "আপনাকে একটা জিজ্ঞেস করতে পারি"? আমি আবার পিছন ফিরে মেয়েটির দিকে কিছুটা এগিয়ে গেলাম। তখনও বুঝে উঠতে পারছি না কি বলবো। অনেক কষ্টে কিছুটা আড়ষ্টতা কাটিয়ে বললাম, "আসলে অনেক দিন বাদে হঠাৎ দিল্লীতে অপ্রত্যাশিত ভাবে গাড়িটাকে দেখে একটু ভাবপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। সত্যিই, আমার আচরণের জন্য আমি খুবই দুঃখিত"। এর পর কি বলবো ভেবে পেলাম না। তাই বোকার মত চেয়ে রইলাম মেয়েটার দিকে। আমি খুবই অস্বস্তি বোধ করছি এইটা বুঝেই বোধহয় মেয়েটি খুবই স্বভাবিক ভাবে কথা বার্তা চালিয়ে যেতে লাগলো -

- দিল্লীতে নতুন?

- বলতে পারেন, চাকরী সূত্রে গত বছর দেড়েক ধরে দিল্লীতে
- আমি বহুদিন থেকেই আছি। এখানেই জন্ম। এখানেই পড়াশুনা। বাবা চাকরী সূত্রে এখানে এসে একেবারে পাকাপাকি ভাবে দিল্লীতে রয়ে গেলেন, তবে কলকাতার সাথে একটা ক্ষীণ যোগাযোগ রয়েই গেছে। আপনিও নিশ্চই কলকাতারই মানুষ ...

আমার নজর আবার আটকে গেছে গাড়ির ভিতরে ড্রাইভারের মাথার পিছনে আলোর সুইচটার উপর। কি অভিনব লাগতো ব্যপারটা। ড্রাইভার দরজা খুললেই ভিতরের লাইটটা জ্বলে ওঠে নিজে থেকেই, তবে সুইচটা জ্বালিয়েও আলোটা জ্বালানো যায়। প্রথম যেদিন গাড়িটা এলো আমি সব কিছু ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে করতে এই জিনিষটা দেখে খুবই আকৃষ্ট হয়েছিলাম।

- আপনি কি ভিতরে ঢুকে গাড়িটা একবার ভালো করে দেখতে চান?

পরীক্ষাতে টুকতে গিয়ে ধরা পরে গেলে যে রকম অবস্থা হয় আমার অবস্থাটা তার চেয়েও খারাপ মনে হলো। 'ইয়ে', 'মানে', এই সব কিছু শব্দ আছে যা বাংলা ব্যকরণের ঠিক কোন পদের অন্তর্ভুক্ত জানি না, তবে সময়ে অসময়ে খুব কাজে আসে। অনেক শক্ত শক্ত প্রশ্নের উত্তরও 'ইয়ে', 'মানে' দিয়ে চালিয়ে দেওয়া যায়। মাঝে মাঝে মনে হয় মানবিকতার খাতিরে এই সমস্ত শব্দগুলিকে একটা বিশেষ মর্যাদা দেওয়া উচিত বাংলা ব্যকরণে। অগত্যা এই 'ইয়ে', 'মানে'র সাহায্য নিয়ে কিছু একটা খাঁড়া করার চেষ্টা করলাম। এবার মেয়েটি হেসে ফেললো। আমার কেন জানি মনে হল' মেয়েটি আমার সাথে মজা করার চেষ্টা করছে। আত্মসাম্মানে লাগলো। আমি তো মেয়েটির প্রতি কোনো আগ্রহ দেখাই নি। তবে ওর গাড়িটর উপর আমি একটু বেশী মাত্রায় আগ্রহ দেখিয়ে ফেলেছি ঠিকই। তবে আমার কি সেই অধিকারও আজ নেই? আজ হয়তো গাড়িটা আর আমাদের নয়, তবুও আমার জীবনের অনেকটা ভাগ জুড়ে তো একদিন এই গাড়িটাই আমাদের পরিবারের এক সদস্য হয়ে ছিলো!! হঠাৎ আত্মসম্মানের কথাটা মনে আসাতে ঠিক করে ফেললাম, "না, আর না, অনেক হয়েছে, যা একবার চলে যায় তার প্রতি কোনো পিছুটান থাকার কোনো মানেই হয় না"। মনে মনে ঠিকই করে ফেললাম একবার মেয়েটিকে কড়া করে কিছু একটা বলে চলে চলে যাবো। কিন্তু কিছু একটা বলার আগেই দেখলাম মেয়েটি সামনের সিটের বাঁদিকের দরজাটা আমার জন্য খুলে দিয়েছে।

বললো, "চলুন, কোথাও একটা বসে কিছুক্ষণ গল্প করা যাক। আপনার কাছে গাড়িটার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমাদের পত্রিকাতে গাড়ির আত্মকথা গোছের কিছু একটা লেখা যেতে পারে"।

কি সাংঘাতিক!! মেয়েটি আবার পত্রিকা টত্রিকা ছাপায় নাকি? আমাকে কি 'রোম্যান হলিডে'র অড্রে হেপবার্নের পুরুষ সংস্করণ পেয়েছে? কিন্তু কিছু একটা জাঁদড়েল উত্তর দেবার আগেই দেখলাম যে আমি গাড়িটার ভিতরে আর মেয়েটি গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে। জনপথ ধরে কনোঠ প্লেসের দিকে চলেছি আমরা। মেয়েটিই কথা শুরু করলো, "আমরা কয়েক বন্ধু মিলে 'দেয়ালা' বলে একটা বাংলা পত্রিকা ছাপাই। বাইরে খুব একটা বিক্রী হয় না। আত্মীয় স্বজন, চেনা শোনা, বন্ধু বান্ধবদের মধ্যেই সীমাদ্ধ"। আমি যেন প্রায় আতকে ওঠার মত বলে ফেললাম,

- দেয়ালা? দেয়ালা মানে তো ঘুমন্ত শিষুর হাসি কান্না!!
- হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। একটা শিষু যতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে পৃথিবীর এই বিশ্রী রূপটা থেকে অনেক দূরে থাকে, আর ততক্ষণই তো তার নিজের নিস্পাপ জগতের কথা বার্তা সে বলে ওঠে তার দেয়ালার মধ্যে দিয়ে। সে যখন বড় হয় তখনও ঘুমের মধ্যে সে অনেক সময় হেসে বা কেঁদে ওঠে। কিন্তু তখন আর তা দেয়ালা থাকে না। কান্নাটা হয়ে যায় কোনো হিংস্র যুদ্ধে হেরে যাবার দীর্ঘশ্বাস, আর হাসিটা হয়ে যায় কোনো অসহায় মানুষকে সর্বস্বান্ত করার উচ্ছ্বাস। তাই প্রাপ্ত

বয়স্ক মানুষের ঘুমের মধ্যে হাসি কান্নার কোনো নাম নেই। সেটা কোনো সাইকলজিকাল সিমটম।

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম ওর কথা, একেবার ওর চোখের দিকে চেয়ে। হঠাৎ মনটা সত্যিই হালকা হয়ে গেলো। অনেক্ষণের মনটাকে লির্লিপ্ত করার প্রচেষ্টা এবার সফল হলো। বাসের ভীড়, মানুষের কোলাহল, ধোঁওয়া, চারিদিকের পারিপার্ষিক কিছুই নজরে এলো না। ভগবান দাসের সিগ্নালে গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, "কোথায় যাবেন বলুন। একটু ফাঁকা যায়গা হলেই ভালো। আপনার কথা ভালো করে শোনা যাবে"। আমার পুরো আড়ষ্টতা কেটে গেছে। আমি বললাম, "না, এখানে না, আপনাকে একটা বিশেষ জায়গায় নিয়ে যাই। চলুন, যাওয়া যাক আমার খুবই প্রিয়, হজ-খস ভিলেজের হোটেল বিস্ত্রোতে, পাঁচশো বছরের পুরোনো একটা কেল্লার মধ্যে অত্যাধুনিক মাল্টিকুইসাইন রেস্টোরেন্ট। তবে সেখানে গিয়ে আমার কথা না, শুনবো দেয়ালার কথা - ..... আপনার কথা"!!

ক্রসিংএ সবুজ আলো জ্বলে উঠেছে। আমার চোখ থেকে চোখ না ফিরিয়েই অল্প একটু হেসে মেয়েটি বললো, "চলুন, তাই হবে"।

Bangalore, 30th April, 1998